॥ সূচনা ॥

[বৈষ্ণব চরিত কাব্য]

ত্রয়োদশ শতকের জন্মমুহূর্তে (১২০৩) তুর্কিদের হাতে গৌড়বিজয় ঘটল। সাধারণভাবে তখন থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বৃটিশবিজয় (১৭৫৭) পর্যন্ত কাল-পর্বকে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসে সাধারণত 'মধ্যযুগ' বলে থাকি। ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়া থেকে বলি 'আধুনিক' যুগ।

তুর্কিদের বা পাঠান-মোগলের আমলে ক্রনিকল, ইতিবৃত্ত, চরিতের বহুল চর্চা হয়েছিল। তবকাৎ-ই-নাসিরী, বাহারিস্তান, তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, তারিখ-ই-মোবারকশাহী, তুজুক-ই-জাহানগীরী অথবা বাবরের আত্মচরিত, আকবরনামা, জাহানগীরের আত্মচরিত প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থের নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সমকালীন হিন্দুদের মধ্যে বাংলাদেশে এই ধরনের রচনার প্রচলন দেখা যায় না। বরং উত্তর-ভারতে 'রাসউ' কাব্যে রাজগাথার সন্ধান মেলে, চন্দবরদাইয়ের 'পৃথ্বীরাজ রাসউ' (এই কাব্য পরে তাঁর পুত্র সমাপ্ত করেন) অথবা 'বিশালদেব রাসউ' প্রভৃতি কাব্য তার প্রমাণ। মারাঠীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল 'বখর', ইতিহাস-চর্চার নিদর্শনরূপে।

মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুর কোনোরূপ রাষ্ট্রচিন্তা ছিল না। সে তুর্কিবিজয়কে বা পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাকে 'ভাগ্য' 'নিয়তি' বা দৈবনির্দিষ্ট কর্ম বলেই মেনে নিয়েছিল। পরবর্তী কালের পাঠান, মোগল বা ব্রিটিশ শক্তির বিজয়ও তার কাছে অনুরূপভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। এ ইতিহাস অগৌরবের হলেও সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই লিখেছিলেন যে ভারতীয়দের বিশ্বাস ছিল :

> "ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব' অশুভের নাম 'দুর্দৈব'। [তাঁহারা] দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন।"

রাজপুত, মারাঠা, শিখের চেয়ে বাঙালীর এই 'বিশ্বাস' অনেক বেশি ছিল।

বাংলাদেশে মধ্যযুগে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ব্যক্তি চৈতন্যদেব (১৪৮৬—১৫৩৩)। হুসেন শাহের রাজ্যকালে (১৪৯৩—১৫১৯) চৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত

হয়ে 'জ্ঞান' অথবা 'কর্ম' পথের চেয়ে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ সাধন-পথ বলে ঘোষণা করেন। তিনি রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না, ধর্ম-সাধক রূপেই তাঁর পরিচয়। হিন্দুসমাজে যারা সনাতনী রক্ষণশীল সম্প্রদায় কর্তৃক উপেক্ষিত অথবা সমাজচ্যুত হয়েছিল তাদের 'হরি হরি বোলাইয়া আচণ্ডালে ধরি' তিনি কোল দিলেন। তিনি উচ্চকুলজাত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ হয়েও সনাতনী সমাজের প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সমাজচ্যুত ব্যক্তিদের বৈষ্ণব সমাজভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে যবন কাজী নত হয়েছেন, রূপ-সনাতন সুলতান হুসেন শাহের কর্মত্যাগ করে বৈষ্ণব সেবাব্রত গ্রহণ করেছেন। অদ্বৈতবাদী বাসুদেব সার্বভৌম তাঁর চারিত্র ও পাণ্ডিত্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন, উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁর প্রসাদলাভে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। এ ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাজেই দেখা যায় সেদিনকার সমগ্র বাংলাদেশের বিরাট এক অংশকে চৈতন্যদেব নতুন আবেগে আনন্দে নবোন্মাদনায় মাতিয়ে তুলেছিলেন। যে মানুষের মধ্যে বড়ো জীবনের প্রকাশ ঘটে, সেই মানুষের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সমগ্র জাতির চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেয়। সেই বড়ো-জীবনের মানুষ তখন পূজার যোগ্য হয়ে ওঠেন, বন্দিত হন দেবকল্প মহিমায়। চৈতন্যদেব তাঁর সমকালে নিজ জীবনের আলোকে বহু জীবনকে আলোকিত, শুদ্ধ করে তুলতে পেরেছিলেন। তখন তাঁকে অবলম্বন করে স্বতঃই রচিত হয়েছে নতুন ভাবের কাব্য, পদ ও সঙ্গীত। চৈতন্যদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই সূত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> "আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘা-কাঠার মধ্যে বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলা লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাঙিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না। বৃহৎ ভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন তর্কবিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপন আপন গর্তের মধ্যে সুড়সুড় করিয়া

প্রবেশ করে। চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলা দেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলা কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল।"[১]

তাই বলতে পারি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব যথার্থই বাঙালি জাতির চৈতন্য-চন্দ্রোদয়। চৈতন্যদেব সাধারণের বহু উর্ধ্বে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সেকালের চরিতকারেরা তাঁকে যেরূপ 'পৌরাণিক' অলৌকিকতায় মণ্ডিত করে দেখিয়েছেন, সেটা মেনে নিতে একালে অনেকেই অপারগ। চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে সহচর মুরারি গুপ্ত ও চৈতন্য-পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন সংস্কৃতে মহাকাব্য ও নাটক রচনা করেছেন।

বৃন্দাবনদাস, লোচন, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চূড়ামণি দাস বাংলা ভাষায় চৈতন্যচরিত লিপিবদ্ধ করেন। বহু পদকর্তা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও রচনা করেন। সকলেই চৈতন্যদেবকে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বা স্বয়ং ঈশ্বররূপে বর্ণনা করেছেন। মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপুর উভয়েই তাঁদের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' রচনাকালে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কথিত 'যদা যদা হি ধর্মস্য' শ্লোকটি ও 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' বর্ণিত কৃষ্ণলীলাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ভাগবতে যেমন শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ অথবা পুরাণগুলিতে যেমন শিব-পার্বতী প্রশ্নোত্তর প্রথারম্ভে দেওয়া হয়েছে, তেমনি দামোদর-মুরারির প্রশ্নোত্তর রীতিতে কাব্য রচনা করেছেন মুরারি গুপ্ত। মুরারি গুপ্ত তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা অর্থাৎ কৃষ্ণাবেশ, প্রলাপ, গোপীভাব, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতির বিশদ বিবরণ না দিলেও প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ করেছেন।[২]

মুরারি গুপ্তের কাব্যে চৈতন্যদেবের তিরোধানের উল্লেখ আছে।[৩] তিনি চৈতন্যদেবের জীবনের যে ঘটনাগুলি বিবৃত করেছেন তাঁর পরবর্তীকালে সকলেই সেগুলির ব্যবহার করেছেন। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের জন্ম থেকেই তাঁর উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছেন। কাজেই মুরারি গুপ্তের গৃহে চৈতন্যদেবের মহাবরাহ রূপ ধারণ, (২/১৩—১৮) চৈতন্যদেবের ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে দেবগণ কর্তৃক শচীর গর্ভ বন্দনা (১/৫), হরিনামে কুষ্ঠরোগীর ব্যাধি আরোগ্য (২/১০), নিত্যানন্দকে প্রথমে 'ষড়্‌ভুজ' তারপর "কদাচতুর্ভুবন্ রূপম্ দ্বিভুজঞ্চ ততঃ

পরাৎ।" (২/২৭) গণপতি প্রতাপরুদ্রকে 'শ্রীবিগ্রহং ষড়্ভুজমদ্ভুতং' রূপপ্রদর্শন (৪/১৩; ৪/২০) প্রভৃতি ঘটনা স্বাভাবিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যখানিতে চৈতন্যদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সবই প্রায় বিবৃত হয়েছে। অলৌকিক অংশগুলিকে বর্জন করলে ঐ কাব্য থেকে আমাদের পক্ষে তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ মানব তথা সাধকের ব্যক্তি-পরিচয় লাভ বহুলাংশে সম্ভব হয়।

তাঁর দুরন্তপনা, মাতাকে প্রহার, শিক্ষা, দুইবার বিবাহ, বন্ধুদের তাঁহার প্রতি কৌতুক-কটাক্ষ, সন্ন্যাস, দেশভ্রমণ, সাধকজীবন যাপন, নীলাচল-লীলা প্রতাপরুদ্রসাক্ষাৎ সবই বিশ্বাস্য তথ্য। বরং মনে হয় মুরারির কাব্যেই অলৌকিকতা অপেক্ষাকৃত কম। পরবর্তী সকলেই ঐ তথ্য ব্যবহার করেছেন ও তার উপর প্রচুর রং চড়িয়েছেন।

চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ঐ কালে খুবই স্বাভাবিক। তার মূল কারণ রচয়িতারা সকলেই চৈতন্যভক্ত। তাঁকে কোনো চরিতকারই 'নর'রূপে দেখেন নি, সকলেই ষড়ৈশ্বর্যময় নারায়ণরূপে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। অবশ্য কোথাও তাঁর মানবরূপ প্রকাশিত হয়নি, এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

চৈতন্যদেব বা অদ্বৈতাচার্য বা নরোত্তমের জীবন নিয়ে যে চরিত কাব্যগুলি রচিত হয়েছে সেগুলি কিয়দ্ পরিমাণে 'গোষ্ঠীকেন্দ্রিক' বা 'সাম্প্রদায়িক' সাহিত্য হতে বাধ্য। চৈতন্য অনুরাগী বৈষ্ণব সমাজ বৈষ্ণব ধর্মগুরুদের যে বিনম্র শ্রদ্ধায় দেখেছেন, অন্যেরা সকলেই তাঁদের অনুরূপ চোখে দেখবেন আশা করা যায় না। বৈষ্ণবেরা বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতকে একটি নতুন ধারা 'চরিত সাহিত্য' এনেছেন একথা অবশ্যস্বীকার্য। চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই তাঁর মহিমাজ্ঞাপক চরিতকাব্য রচনা শুরু হয়েছে। ভক্ত বৈষ্ণবেরা চরিতকাব্য রচনায় মেনে নিয়েছিলেন 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর' দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য পাশ্চাত্যেও ধর্মগুরুদের চরিত্রমহিমাবর্ণিত রচনায় অর্থাৎ Hagio-graphyগুলিতে অলৌকিকতা, মহিমা প্রতিষ্ঠাসূচক অবিশ্বাস্য ঘটনার উপস্থাপনা যথেষ্ট বিদ্যমান।[৪] ইউরোপেও মধ্যযুগে জনসাধারণের মনে ধর্মগুরুদের সম্পর্কে অন্ধ ভক্তি ও প্রশ্নহীন শ্রদ্ধা ছিল। থুকিডিডিসের ইতিহাসের আদর্শ তখন আর বেঁচে ছিল না। 'Biography'র বিশিষ্ট লক্ষণ হল ব্যষ্টি মানুষের ইতিবৃত্ত রচনা। সেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হবে। কিন্তু Hagio-graphy

বা Legends of the Saintsকে দেখা যায় মোটামুটিভাবে খ্রিষ্টীয় বা বৌদ্ধসন্তদের চরিতকাহিনীগুলি সবই এক ছাঁচের, প্রায় একই ছকের।[৫]

বৈষ্ণবজীবনী সম্পর্কে একই কথা বলা অবশ্য ঠিক হবে না, যদিও সকল বৈষ্ণব চরিতকাব্যেই অলৌকিক ঘটনা বা অতিপ্রাকৃত উপাদান বহুল পরিমাণে সন্নিবেশিত হয়েছে। মর্ত্যের মানুষকে 'অবতার' বা ভগবানরূপে গড়তে গেলে অলৌকিক মহিমা আরোপ ছাড়া সম্ভব হবে কি করে?

চৈতন্যচরিত ও অন্যান্য বৈষ্ণব জীবনীতে অলৌকিকতা আরোপ প্রসঙ্গে একটি কথা স্বভাবতই মনে হয়। মুরারি গুপ্ত ও কবি কর্ণপুর তাঁদের কাব্য ও নাটক লিখেছেন সংস্কৃত মহাকাব্য, পুরাণ ও নাটকের আদর্শে। পুরাণে অলৌকিক কাহিনীর প্রাচুর্য লক্ষণীয়। চৈতন্যদেবের ভগবত্তা বা ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মুরারি ও কর্ণপুর বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ আয়াস করেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় বৃন্দাবনদাস, লোচন ও জয়ানন্দ যে চৈতন্য জীবনী লিখেছেন বা তাঁদের পরবর্তীকালে অদ্বৈত, নরোত্তম প্রভৃতির যে চরিতকাব্য রচিত হয়েছে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন বৈষ্ণবদের হাতের 'মঙ্গলকাব্য'। বিভিন্ন লৌকিক বা অর্ধ-পৌরাণিক দেবদেবীর যেমন, মনসা, চণ্ডী বা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার মৌল আকাঙ্ক্ষায় একদা মঙ্গলকাব্যগুলির জন্ম। ছলে বলে প্রতিপক্ষের পরাজয় বা পূজা ঘটিয়ে নিজেদের পূজা প্রবর্তন ও ভক্তকে কৃপা বিতরণ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণের মুখ্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব কবিদের অনেকে তাঁদের কাব্যকে মঙ্গলকাব্যের ছাঁচেই গড়তে চেয়েছিলেন, চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি নাম তারই সাক্ষ্যবহ। শুধু গঠনে নয় এই পর্যায়ের কাব্যে দেখা যায় মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের অনুরূপ বৈষ্ণবধর্মগুরুদেরও অসীম দৈবশক্তি, অলৌকিক বল-প্রয়োগে বিরোধী পক্ষকে দমন বা তাদের সংশয় প্রশমন করবার অসংখ্য বৃত্তান্ত। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন:

দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
'মুঞি সেই মুঞি সেই' বোলে বার বার।
এই মতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে
'কি করিস শ্রীবাসিয়া।' বোলে অহঙ্কারে।
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে।

"কাহারে বা পূজিস করিস কার ধ্যান।
যাহারে পূজিস তারে দেখ বিদ্যমান।"

শ্রীবাস সবিস্ময়ে দেখলেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ। চৈতন্যদেব তখন আদেশ করলেন:

'সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব।'[৬]

শেষ শ্লোকটিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিধ্বনি থাকলেও মঙ্গলকাব্যের spirit ও অলক্ষিত নয়। চরিতকাব্যগুলিতে চৈতন্যদেবের মুখে বহুবার এই উক্তি বসানো হয়েছে যে তিনিই বিষ্ণু, কংসারি কৃষ্ণ, রাবণারি রাম, বলিদর্পহারী বামন ইত্যাদি। (বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কৃষ্ণও অনেকটা এই ধরনের 'ঐশ্বর্য' দম্ভ বারংবার প্রকাশ করেছে)। অথবা যখন ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের নিজের মুখে বচন বসানো হয়:

বলিতে প্রভুর হৈল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড়মড়ি করি বোলয়ে বিশেষ।
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে।
পড়ায়ে বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তভু নাহি জানে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে।[৭]

এগুলির সঙ্গে বাংলা মঙ্গলকাব্যের 'সাম্প্রদায়িক' দেবদেবীর উক্তির পার্থক্য কোথায়?

কিংবা— মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে
যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে।[৮]

এই ধরনের দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এর চেয়েও আশ্চর্যের কথা ষোড়শ শতকের শেষভাগে রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে জয়ানন্দ, নবদ্বীপে যবন অত্যাচার প্রসঙ্গে গৌড়রাজার স্বপ্ন বর্ণনায় শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবদের পক্ষে শাক্তদেবী মহাকালীকে খাড়া করেছেন:

কালী খড়্গ খর্পরধারিণী দিগম্বরী।
মুণ্ডমালা গলে কাহু কাহু শব্দ করি।

আমি তোর সভায় পেলিনু রাজ্যপাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট।

এখানে ক্ষমতাপ্রদর্শন বা শাস্তিদানের হুমকি মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীরই উপযুক্ত। জয়ানন্দ লিখেছেন:

নাকে খত দিল রাজা তবে কাজী ছাড়ে।[9]

নরহরি চক্রবর্তীর 'নরোত্তম বিলাস' কাব্যেও অনুরূপ ভাবে বৈষ্ণবধর্ম বিরোধী অধ্যাপকের শাস্তিপ্রদানে বাধ্য হয়ে 'ভগবতী' তাঁরা স্বপ্ন দেখিয়েছেন:

দেখয়ে স্বপন দেবী হাতে খড়্গ লৈয়া।
সম্মুখে কহয়ে মহা ক্রোধযুক্তা হৈয়া।
বৃথা অধ্যয়ন কৈলি ওরে দুষ্টমতি।
বৈষ্ণব নিন্দিলি তোর হবে অধোগতি।
তোর মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান।
তবে সে মনের দুঃখ হয় সমাধান।
ওরে দুষ্ট অসুর কি দিব তোরে শিক্ষা।
নরোত্তম অনুগ্রহে হৈল তোর রক্ষা।[10]

নরোত্তম বিলাসে বর্ণিত 'ভগবতী'র ক্রোধের সঙ্গে 'প্রেমবিলাস' বর্ণিত চণ্ডিকার ক্রোধের মিল আছে। 'পাষণ্ডী'দের নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবীর প্রতি নিন্দাবাক্য শুনে চণ্ডিকা বললেন:

জাহ্নবী দেবীরে তোরা করিলি বিদ্রূপ।
সেই অপরাধে তোদের হবে মহাদুঃখ।[11]

সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত (১৬১৫) গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সবচেয়ে শ্রদ্ধার বস্তু। দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমৃদ্ধ এই মহাগ্রন্থেও পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি বহুস্থলে সুস্পষ্ট। জনৈক বিপ্র কর্তৃক শ্রীবাস গৃহে ভবানীপূজার দ্রব্যাদি স্থাপন ও রক্তচন্দন লেপনের অপরাধে তিন দিন পরে সেই বিপ্র কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। চৈতন্যদেবের করুণা প্রার্থনা করলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন:

আরে পাপি ভক্তদ্বেষি তোরে উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম ঐছে তোরে কীড়ায় খাওয়াইমু।
শ্রীবাসেরে করাইলি ভবানীপূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন।

পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।[12]

এই ক্ষেত্রে মুরারি গুপ্তের বর্ণনাকে অবলম্বন করলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারি-প্রদত্ত বর্ণনাকে ছাড়িয়ে স্বকপোল কল্পনাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থান দিয়েছেন।

মঙ্গলকাব্যের ধরনে ভক্তদের কল্পনা কতদূর গিয়েছিল তার আরো একটি দৃষ্টান্ত পাই, নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে মুসলমান শাসনকর্তা শের খাঁর দর্পনাশ হেতু চৈতন্যদেবকে 'আল্লা' সত্ত্ব ঘোষণা করা হয়েছে স্বপ্নে চৈতন্যদেব বলেছেন:

'আমি তোর আল্লা হই আল্লার স্বরূপ'।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি থেকে স্বতঃই প্রতীয়মান হবে যে, চৈতন্যকাব্যগুলিতে চৈতন্যদেবের 'মানব'রূপ অপেক্ষা শক্তিমান 'ভগবান' রূপ অথবা 'অবতার'রূপ প্রতিষ্ঠা ভক্ত চরিতকারদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

দেখা গেল বৈষ্ণব জীবনী-কাব্যগুলিতে গীতা, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের উল্লেখ ও অনুসরণ থাকলেও মঙ্গলকাব্যের spirit এবং formও অলক্ষিত নয়। কাজেই চৈতন্যচরিত বা অন্যান্য বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থকে প্রামাণিক রূপে স্বীকার করা আধুনিক কালের পক্ষে কঠিন। কেন না অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনার বাহুল্য মধ্যযুগের এই পর্যায়ের কাব্যে স্বাভাবিক।

কিন্তু যে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মহামান্য গ্রন্থ, সেখানে বাসুদেব সার্বভৌম ও চৈতন্যদেবের বিচারের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা কর্তব্য। কেননা ঐ বর্ণনা মূলতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিয়েছেন কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের (১৫৪২) দ্বাদশ সর্গ থেকে। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও সার্বভৌমের পরাজয়ের কথা কর্ণপুর লিখেছেন। কিন্তু সেখানে উভয়পক্ষের যুক্তিতর্কের সমস্ত কথা জানা যায় না। তাছাড়া বাসুদেব সার্বভৌম প্রদত্ত যুক্তিগুলি এখানে চৈতন্যদেবের মুখে বসানো হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত অপর বিশিষ্ট অধ্যায়, মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধ্য সাধনতত্ত্ব বা রায় রামানন্দ সংবাদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ অংশে মূলস্বরূপে কবি কর্ণপুরের রচিত মহাকাব্য ও নাটক থেকে গ্রহণ করেছেন এবং রামানন্দের মুখ দিয়ে রূপ গোস্বামী কৃত হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল-নীলমণির অবিকল বঙ্গানুবাদ বসিয়েছেন।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর রচিত হয়েছে এমন বহু দার্শনিক নিবন্ধ

তার তথ্যগত প্রামাণিকতা কম। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস যে সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলির সঙ্গে জয়ানন্দ প্রদত্ত তথ্যের গুরুতর গরমিল বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে। তথ্যগত ত্রুটির জন্য জয়ানন্দের কাব্য সমাদৃত হয় না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে একখানি চরিতকাব্য রচনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কর্তৃক প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত চৈতন্যদেবের নব অবতারতত্ত্ব, অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্তকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলনের আকাঙ্ক্ষাই যেন প্রধান ছিল।

চৈতন্যদেবের নব-অবতারত্ব, নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেননি। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, লোচন, জয়ানন্দ স্বরূপ-দামোদরের নামে প্রচলিত "শ্রীরাধায়া প্রণয়মহিমা কীদৃশো" ইত্যাদি তত্ত্বকে ঠিক স্বীকার করেননি। 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটক' চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের বহুপরে ১৪৯৪ শকে পুরীধামে রচিত হয়। কিন্তু কবিকর্ণপুর স্পষ্টই লিখেছেন যে অদ্বৈতাচার্যের জন্য, নাম-সংকীর্তন প্রচার প্রভৃতির জন্যই চৈতন্যাবির্ভাব। অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যুগধর্ম, নামপ্রেম প্রভৃতিকে 'বহিরঙ্গ' এবং শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি ধারণ করে প্রেমাস্বাদনকেই 'অন্তরঙ্গ' কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। কৃষ্ণদাসের দৃষ্টিভঙ্গি নিজস্ব কিছু নয়, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের ব্যাখ্যাত তত্ত্ব ও দার্শনিক সিদ্ধান্তকে তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনায় প্রয়োগ করেছেন। চৈতন্যদেবের জীবনের অন্ত্যলীলা রচনায় তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলা চলে। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের গোপীভাবে প্রকাশ, প্রলাপ-উক্তি প্রভৃতির যে ইঙ্গিত রেখে গিয়েছিলেন, কৃষ্ণদাস তার সম্পূর্ণ-সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলে চৈতন্যচরিতামৃতে তথ্যগত অসামঞ্জস্য বহু মিলবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ পূর্বপ্রচলিত তথ্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তিনি নিজের কল্পিত অনেক ঘটনা বসিয়েছেন এবং পূর্ব প্রচলিত তথ্যকে নিজের বিশ্বাসের দৃষ্টির অনুকূল করে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। চৈতন্যদেব-সার্বভৌম-বার্তা তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে বললেন:

"জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাঙ আমি।
উদ্দেশ্য আমার সব এথা আছ তুমি।

তোমাতে যে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি যে শিখাবে পার কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি।[১৭]

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে পাই সার্বভৌম চৈতন্যদেবের কাছে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা বা বিচার কোনোটিই করেননি। তিনি শুধু 'আত্মারামাশ্চ মুনয়োঃ' শ্লোকটির ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করেন। তারপরও চৈতন্যদেব নতুন-ব্যাখ্যা দিতে চান:

শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইলা ষড়ভুজ অবতার।[১৮]

উদ্ধৃত অংশের অলৌকিকতা বর্জন করা গেলে জানা যায় সার্বভৌমের "আত্মারামাশ্চ" ব্যাখ্যার পর চৈতন্যদেব নিজস্ব মতানুযায়ী নব ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, এই মাত্র। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেব কর্তৃক সার্বভৌম-অনুগ্রহ বর্ণনা করেছেন, তবে ঐশ্বর্য দেখিয়ে সার্বভৌমকে বশ করার কথা সেখানে নেই। অবশ্য ঐ প্রসঙ্গে সার্বভৌম চৈতন্য-স্তব পাঠ করেছেন দেখতে পাই।

কবিকর্ণপুর তাঁর মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গে ও নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে চৈতন্যদেব ও সার্বভৌমের বিচার ও সার্বভৌমের পরাজয় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের বিস্তৃত কোনো বিবরণ নেই। কবিকর্ণপুর "আত্মারামাশ্চ মুনয়োঃ" শ্লোক ব্যাখ্যার উল্লেখ করেননি। পরন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের মুখে বেদান্ত-বিচার প্রসঙ্গে যে যুক্তিগুলি বসিয়েছেন সেগুলি কবিকর্ণপুরের নাটকে প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমের নিজেরই উক্তি। কেননা নাটকে দেখি সার্বভৌম নিজেই শেষে চৈতন্যদেবের কাছে এসে তাঁর পূর্বপোষিত অদ্বৈতবাদ মতের খণ্ডন করেছেন। এ ধরণের বহু তথ্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে। কাজেই বলা যায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' দার্শনিক তত্ত্বে "অমৃতের পুর" হতে পারে কিন্তু উৎকৃষ্ট চরিতকাব্য হয়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যগত প্রামাণিকতার অভাবে।

চৈতন্যচরিতগুলি ছাড়া অন্যান্য যে বৈষ্ণবজীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলিতে তথ্যগত প্রামাণিকতার অভাব আরো বেশি। উল্লেখযোগ্য কাব্য হিসাবে ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' বা নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম বিলাস' অথবা নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' আলোচনা করলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। ঈশান নাগরের গ্রন্থে প্রদত্ত রচনাকাল (১৪৯০ শক)

পর ও কাব্যের উৎকলিত অংশে চৈতন্যদেবের কার্যধারায় প্রযুক্ত হয়েছে, এমন কি স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের মুখেও বসানো হয়েছে।[১৩] কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের মুখে অর্বাচীন পুরাণ 'ব্রহ্মবৈবর্তের' শ্লোক উদ্ধার করে কাজীর পরাজয় ঘটিয়েছেন। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার বাংলা ভাষার চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বৃন্দাবনদাসের গুরু ছিলেন নিত্যানন্দ, তাঁরই নির্দেশে বৃন্দাবনদাস অগ্রসর হয়েছিলেন 'চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে'। বৃন্দাবনদাসের কাব্য পড়লে মনে হয় যে এই কাব্য রচনাকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ-বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল। তা না হলে সমগ্র কাব্য জুড়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে এমন ভাবে নিত্যানন্দ বন্দনা করা হত না। নিত্যানন্দ-বিরোধী গোষ্ঠীর উদ্দেশে তিনি অবৈষ্ণবের মতো বলেন:

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।

তেমনি লোচনদাস ছিলেন শ্রীখণ্ডের 'গৌরনাগর' মতের প্রবক্তা নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। তিনি তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে গুরু নরহরিকে কৌশলে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। বৃন্দাবনদাস চেষ্টা করেছেন নিত্যানন্দ মহিমা প্রতিষ্ঠার। লোচনদাস অগ্রসর হন নরহরি-মাহাত্ম্য স্থাপনে— 'নরহরি-চৈতন্য বলিয়া প্রভুর খ্যাতি।' কাজেই দুজনেই চৈতন্য-চরিত রচনার মাধ্যমে নিজ নিজ গুরুর মহিমা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন। অর্থাৎ চৈতন্যচরিত কাব্য রচনাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না।

অনুরূপভাবে জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে তার গুরু গদাধরের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। তিনি 'গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি' চৈতন্যমঙ্গল রচনায় অগ্রসর হন। তাই লেখেন:

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর পদ দ্বয়
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ।

অবশ্য গদাধর সম্পর্কে চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব সমাজে এই মত প্রচলিত ছিল যে, গদাধর শ্রীরাধার অবতার।[১৪] জয়ানন্দ তাই চৈতন্যদেবের মুখে বলিয়েছেন:

আমি গৃহস্থ গদাধর সে গৃহিণী।
আমি উদাসীন গদাধর উদাসিনী।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'রূপ-রঘুনাথ' গোস্বামীদ্বয়ের পদবন্দনা ভণিতায় করেছেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবন-কেন্দ্রের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ হৃতজ্যোতি, নানা উপদলে খণ্ডিত। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দৃষ্টিভঙ্গি বৃন্দাবন, লোচন, জয়ানন্দ সকলের থেকেই পৃথক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের কাছে শিক্ষিত ও দীক্ষিত, তিনি তাঁদেরই ব্যাখ্যাত দার্শনিক মত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে রূপায়িত করেছেন। বৃন্দাবনদাসকে তিনি 'চৈতন্য-লীলার ব্যাস' বললেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়।

বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্যে চৈতন্যাবতারের কারণ স্বরূপ গীতার 'সম্ভবামি যুগে যুগে' তত্ত্বকে মুখ্যস্থান দিয়েছেন এবং হরিসংকীর্তনকে কলিযুগের ধর্মরূপে আখ্যাত করেছেন। তিনি মুখ্যতঃ ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে চৈতন্যলীলা রচনার প্রয়াস পেয়েছেন কাব্যের আদিখণ্ডে। নরহরি প্রচারিত ও লোচনদাস গৃহীত 'গৌরনাগর তত্ত্বের' বিরোধী ছিলেন বৃন্দাবনদাস।

লোচনদাস রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে গৌরনাগর তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। তিনি বহুক্ষেত্রে মুরারি গুপ্তের কাব্যের অনুবাদ ও অনুসরণ করেছেন সত্য কিন্তু গুরু নরহরি ব্যাখ্যাত তত্ত্বকে স্থান দিয়েছেন। তাই বৃন্দাবন, যমুনা, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীর সমান্তরাল করে তিনি নবদ্বীপ, ভাগীরথী, গৌরাঙ্গ ও নদীয়া নাগরীদের এঁকেছেন। গৌরাঙ্গের বিবাহকালে নদীয়া-নাগরীদের কামমোহিত বর্ণনা গৌরনাগর তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

জয়ানন্দও পুরাণের ঢঙে বসুমতীসহ দেবগণের ক্ষীরোদ সাগরে গমন, দেবগণের বিভিন্ন নামে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন, কাব্যের শেষের দিকে পুরাণের মতই কলিযুগবর্ণন ও বহু পৌরাণিক আখ্যান (ধ্রুবচরিত্র, অজামিল উপাখ্যান) সন্নিবেশ করেছেন। আবার মঙ্গলকাব্যের মত দেবদেবী বন্দনা, স্বপ্নাধ্যায়, নারীগণের পতিনিন্দা, লক্ষ্মীর রন্ধন, নৌকাযাত্রা বর্ণনা, বারমাস্যা, সবই জয়ানন্দ ব্যবহার করেছেন। জয়ানন্দ বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাব্য রচনা করেন নি। চৈতন্যদেবকে তিনি ভগবান বা ঐশ্বর্যসম্পন্ন অবতার-রূপেই বর্ণনা করলেও তিনি চৈতন্যদেবের 'বাস্তব' মৃত্যু বর্ণনা করেছেন।[১৫] আসলে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান ঘটে ব্যাধনিক্ষিপ্ত শর বাম পদে লেগে। জয়ানন্দ তার প্রতিরূপ দেখতে চেয়েছেন মাত্র।

কিন্তু জয়ানন্দ তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের জীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন

থেকে শুরু করে অধিকাংশ বর্ণিত তথ্যেরই ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নেই। যেমন ভাবে বৃন্দাবনদাস তাঁর দীক্ষাগুরু নিত্যানন্দকে এবং লোচনদাস তাঁর দীক্ষাগুরু নরহরি সরকার ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় আত্মারূপে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন, অনুরূপ চেষ্টা দেখি 'অদ্বৈতপ্রকাশ' কাব্যে। শিবের সঙ্গে মহাবিষ্ণুর আগমন এবং ঘোষণা 'তোর মোর এক আত্মা', তার ফলে 'দুই দেহ এক হৈল'—এই বর্ণনায় অদ্বৈতাচার্যকে শিব-বিষ্ণুর যুগরূপ দেখানো হয়েছে। সেজন্য চৈতন্য-চরিতামৃতের অনুকরণে বিবৃত হয়েছে, যে শান্তিপুরের কুলীন ব্রাহ্মণগণের দর্পনাশের জন্য অদ্বৈত :

দয়া করি প্রভু তবে দেখায় স্বরূপ
মহাবিষ্ণু সদাশিব দুই এক রূপ।
রূপ দেখি দ্বিজগণের হৈল ভাবোদ্গম।
অশ্রুকম্প পুলক হবে কদম্বের সম॥

অদ্বৈতের জীবনী-রচনা ঈশানের কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কেননা শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস বর্ণনার পর থেকে চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাই প্রধানতঃ বর্ণিত হয়েছে। অসংখ্য তথ্যগত প্রমাদের জন্য জীবনীকাব্য হিসাবে 'অদ্বৈত-প্রকাশ' একেবারেই ব্যর্থ।

নরহরির 'ভক্তিরত্নাকর' বহু 'তরঙ্গ' সমৃদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ, কিন্তু একে সর্বার্থসাধক বৈষ্ণবকোষ-গ্রন্থ বললেই ঠিক হয়। 'শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্তা করি' তিনি 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে চৈতন্য-চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-নরহরি, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-বীরহাম্বীর প্রভৃতির বর্ণনায় কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। তবে ছন্দ ও সংগীত সম্পর্কে বহু তথ্য আছে। নরহরি চক্রবর্তীর নিজস্ব বহু পদ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। জীবনীকাব্য এ নয়, তবে বৈষ্ণব-ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু পরবর্তী রচনা 'নরোত্তম-বিলাস' মোটামুটি নরোত্তমের চরিতকাব্য, প্রচুর অলৌকিক ঘটনার স্থাপনা সত্ত্বেও। এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক বৃন্দাবনের লোকনাথ গোস্বামীর বিবরণ। লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমের দীক্ষাগুরু ছিলেন। খেতুরীর মহোৎসব (১৫৮১-৮২), বড়বিগ্রহ স্থাপন, রস-কীর্তনের সৃষ্টি প্রভৃতির বর্ণনা প্রামাণিক বলে গ্রাহ্য হতে পারে।

নিত্যানন্দের কনিষ্ঠাপত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য নিত্যানন্দদাস রচিত 'প্রেমবিলাস' সপ্তদশ শতকের কাব্য। গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব-

জীবনীসংগ্রহ। এর সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। লেখক জানিয়েছেন এ সময় যাড়ে-বাঙ্গে অনেকেই নিজের নিজের ঈশ্বরত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ, বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ ও গৌড়ীয় মহান্তদের জীবনের বহু বৃত্তান্ত এ-কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাদের সত্যতা সর্বথা স্বীকার্য নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বীর হাম্বীরের দৈন্যদল কর্তৃক শাস্ত্র-গ্রন্থাদি ও চৈতন্য-চরিতামৃত লুণ্ঠনবার্তা শুনে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৃত্যুর তথ্যটি বিচারের অপেক্ষা রাখে। অসংখ্য অতি-প্রাকৃত, অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাহার ঘটলেও 'প্রেমবিলাস' বৈষ্ণব-গুরুদের জীবনীর উপাদান-গ্রন্থরূপে গৃহীত হতে পারে।

বহু জীবনীকাব্য রচনা করেছিলেন বৈষ্ণবেরা। পূর্বেই বলা হয়েছে এই কাব্যগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ধর্মগুরুদের ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন আর তারই সঙ্গে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ বা অন্যান্য গোস্বামীবৃন্দের কল্পিত বা আরোপিত স্বরূপ নির্ণয়ণ। তাই নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু শ্রীনিবাস আচার্যকে বলেন :

আমি নিত্যানন্দের শক্তি তুমি চৈতন্যের।
তুমি আমি এক বস্তু অগম্য অন্যের॥[১৯]

এই ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্ব প্রতিষ্ঠায় লাগিয়ে তাঁরা অবিচল ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যমত শাসিত হিন্দুসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে নূতন ধর্মগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের মহিমা ও ঈশ্বরত্ব আরোপ অনিবার্য। যেহেতু সে-যুগে 'শাস্ত্র-প্রামাণ্য' ভিন্ন অন্য কিছু স্বীকৃত হত না, সেজন্য বিভিন্ন শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি-গ্রন্থ থেকে উক্ত উদ্দেশ্যের অনুকূল শ্লোকগুলিকে নিপুণভাবে চয়ন করবার চেষ্টা চলেছে। শুধু 'শাস্ত্র-প্রামাণ্য' দ্বারা ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্ব বুঝি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করে না দেখাতে পারলে কারো চরিত্রই ভয়, বিস্ময় বা শ্রদ্ধা উদ্রেকক্ষম হয় না। কাজেই পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী চরিত্রের মতো বৈষ্ণবচরিত কাব্যে বর্ণিত ধর্মগুরুদের কখনো বা অসীম অলৌকিক শক্তি বর্ণিত হয়েছে। সেদিন বৈষ্ণব সমাজের সাধক ও ধর্মসংস্কারক গোষ্ঠীর নেতাদের অতি-মানব-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তবু অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ঘটনাস্থাপন এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রকৃত তথ্যবর্ণন বা হাস্যকর যুক্তিজাল প্রদর্শন সত্ত্বেও এগুলির মূল্য অস্বীকৃত হয় না।[২০] চৈতন্যদেব এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-ধর্মগুরু ও

সাধকদের জীবনের মোটামুটি পরিচয় এগুলি থেকে লাভ করা অসম্ভব হয় না এবং বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাসও অপরিজ্ঞাত থাকে না। এই সূত্রে মধ্যযুগীয় 'Saint'দের চরিতগ্রন্থগুলি সম্পর্কে সমালোচক ক্রশের মন্তব্য স্মরণীয়

> Though the lives of the Saints are fitted with miracles and incredible stories, they form a rich mine of information concerning the life and customs of the people Some of them are memorials of the best men of the times

একথা অবশ্যস্বীকার্য, যে প্রবীণ, মানব-পন্থী (Humanistic) দৃষ্টি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রণয়ন করেছিলেন সে-দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে আশা করা দুরাশামাত্র। তাঁদের পক্ষে প্রত্যক্ষবাদী পজিটিভিস্ট কঁৎ (Comte) ও তাঁর অনুগামী জন স্টুয়ার্ট মিলের শিষ্য[21] বঙ্কিমচন্দ্রের মতো 'লোকাচার ও দেশাচারের' ঊর্ধ্বে উঠে বলা কি সম্ভব ছিল :

> "বুদ্ধিমান পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাসমূলক। সত্য বটে, এই সকল অবতার পুরাণে কীর্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিচারের নিয়ম সম্পর্কে তিনটি সূত্র উল্লেখ করেছেন,

> "১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব তাহা পরিত্যাগ করিব।
>
> ২। যাহা অতিপ্রকৃত তাহা পরিত্যাগ করিব।
>
> ৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয় বা অতিপ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্যপ্রকারে মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।"[22]

বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতকের রেনেসাঁস-যুগের 'শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ' বঙ্কিমচন্দ্র পজিটিভিজম্ প্রভাবিত যুক্তিধর্মী মনের যে-পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র'

গ্রন্থ রচনায়, সেই দৃষ্টিভঙ্গি কী করে আশা করব মধ্যযুগের বাংলাদেশে ভক্তিনির্ভর 'চৈতন্য-চরিত্র' কাব্যগ্রন্থগুলিতে ?

পাদটীকা

১। চিঠিপত্র (১২৯৪) রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (বিশ্বভারতী সং)। আরও লিখেছেন : "তেমনি যাহাদের বড় প্রাণ তাহারা বেশিদিন নিজের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেনা, জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। চৈতন্যদেব ইহার প্রমাণ" ।—তদেব।

২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত। ৪র্থ প্রক্রম, ২৪শ সর্গ, ১-১১।

৩। তদেব। ১ম প্রক্রম, ২য় সর্গ, ১০-১৫।

৪। 'Hagio' শব্দের অর্থ Saint, ধর্মের জন্য যিনি প্রাণত্যাগ করেছেন। কাজেই Hagio-graphy বলতে আমরা 'সন্তচরিত' বুঝতে পারি। এগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য 'writings inspired by devotion and intended to promote it.'

৫। 'Every martyr as a rule is animated by the same sentiments, expresses the same opinions and is subject to the same trials' (Legends of the Saints. An Introduction to Hagio-graphy. Pere H Dele-haya S. J. Bollandist. Translated by Mrs. V. M. Crawford, 1907)

৬। চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২য় অধ্যায়।

৭। তদেব। মধ্য, ২০শ অধ্যায়।

৮। তদেব। মধ্য, ২১শ অধ্যায়।

৯। চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ, আদিখণ্ড। জয়ানন্দ শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পাষাণী অহল্যা-উদ্ধারের অনুকরণে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক পাষাণী-তিলোত্তমা-উদ্ধার বর্ণনা করেছেন।

১০। নরোত্তম-বিলাস, ১০ম বিলাস।

১১। প্রেমবিলাস, ১৯শ বিলাস।

১২। চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৭শ অধ্যায়। দ্রঃ মুরারি গুপ্ত ২য় প্রক্রম ১৩।১১

১৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, বিদগ্ধমাধব